শিক্ষা সমাজ দেশ

দেশ-সংস্কারের খোলাবাজারে বারোয়ারি বয়ান

– ড. হাসনান আহমেদ

(প্রকাশিত শিরোনাম: দেশ সংস্কারে যা করা যেতে পারে)

দেশ-সংস্কার মৌসুম চলছে। বিগত সরকার পতনের আগে ও পরে দেশ-সংস্কার নিয়ে অনেবারই এ কলামে লিখেছি। আগের লেখাগুলো পতিত সরকার গুরুত্ব দেয়নি। পরে তিন-চারটা লেখায় বেশ কিছু সংস্কার-ভাবনা দল-নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছি। একই কথা অবশ্য বারবার লিখতেও খারাপ লাগে। একটাই উদ্দেশ্য, লক্ষ্যভ্রষ্ট দেশের কীভাবে কল্যাণ করা যায়। বর্তমানে এদেশের আইন ও নিয়ম-নীতিতে সংস্কারের তোড়জোড় দেখে আরো কিছু কথা লেখার প্রয়াস অব্যহত রাখছি। এগুলোকে বারোয়ারি বয়ান বলা যায়। জানি না, এসব কথা হালে পানি পাবে কি না। একটা কথা আগে বলে রাখি: স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড দেখতে দেখতে দলগুলো সম্বন্ধে একটা নেতিবাচক ধারণা আগে থেকেই মনে জন্মেছিল; বিগত ১৬ বছরে রাজনীতিকদের সীমাহীন দুষ্কর্মে মনের গভীরে ঘৃণায় দগদগে ঘা সৃষ্টি হয়েছে, যা মলম মালিশে নিশ্চয়ই যাবে না; বেশি-মাত্রার এন্টিবায়োটিক প্রয়োগের কথা। কারণ সদ্য পতিত রাজনীতিকরা নিজেরা লুটেপুটে খেয়েছে, আবার সাধারণ জনগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে রেখে গেছে, যা এত সহজে মেরামতযোগ্য নয়। এতে নীতি-আদর্শহীন সামাজিক টাউটদের পোয়াবারো হয়েছে। এখনো সমাজের পরতে পরতে তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান, সেসব চোরচোট্টা ও বিবেকবোধরহিতরা ধর্মের কাহিনী শুনবে না, জীবনযাত্রাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে, দেশকে আরো ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে। তারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাংলাদেশিদের আবদ্ধ না করা পর্যন্ত পূর্ণ তৃপ্তি পাবে না, তাদের এ অপচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তাদের 'পিরিতে মজেছে মন, কিবা মুচি, কিবা ডোম'।

সাধারণভাবে অতি বুদ্ধিমান প্রাণিকে দুভাবে ভাগ করা যায়– মানুষ এবং অমানুষ। মনুষ্যত্বের গুণাবলী যাদের মধ্যে বেশি তাদেরকে মানুষ বলা যায়। অমানুষ দেখতে মানুষের মতো হলেও তারা বর্বর দলভুক্ত। আভিধানিক অর্থে অমানুষ বলতে মনুষ্যত্ববর্জিত, পশুতুল্য মানুষ বোঝায়; আমার দৃষ্টিতে এদেরকে 'নরাধম' বলা যায়। এরা মানুষ নামের কলঙ্ক, স্বদেশবিরোধী, পরচ্ছন্দানুবর্তী। ভাবতে কষ্ট লাগে, ১৬ বছর যারা আধিপত্যবাদী প্রভুর সহায়তায় গুরু-চেলা মিলে বিরোধী দলগুলো নির্মূলের উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ দমন-পীড়ন-নির্যাতন, গুম-হত্যা, ডাহা মিথ্যাচারিতা করলো, হাজার হাজার ছাত্র-জনতার বুকে নির্দ্বিধায় গুলি চালালো, সাধারণ মানুষের অর্থকড়ি, ব্যাংক-লুটপাট, বেপরোয়া আত্মসাৎ ও সর্বস্ব বিদেশে পাচার করে দেশবাসীকে আকণ্ঠ ঋণের ভারে ডুবিয়ে কোষাগার চেটেপুটে বিদেশে পালালো, তাদের মধ্যে ন্যূনতম অনুশোচনা ও অপরাধবোধ কাজ করে না। অমানুষের কোন নিম্নপর্যায়ে পৌঁছলে তারা নিজেদেরকে এখনও মানুষ বলে দাবি করতে পারে, আজব কাণ্ড ও অমানুষ বটে! ঢাকার শাপলা-চত্বর ট্রাজেডি থেকেই আমি তাদের মনুষ্যত্ববর্জিত মানুষ নামের কলঙ্ক, ধাপ্পাবাজ ও পলিটিক্যাল টাউট বলে চিনে ফেলেছিলাম। এদের সংখ্যা এদেশে নেহায়েত কম নয়। এজন্যই দেশ মেরামত এত সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

অনেকে দুর্নীতি-গণহত্যা করেছে, আবার অনেকে তাদের দেখে শিখেছে, সুযোগ পেলে বাস্তবে কাজে লাগাবে। তাই প্রথম প্রস্তাব হলো: রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক সংস্কার আগে না করলে অন্য আইন সংস্কারে তেমন ফলোদয় কিছু হবে না। ক্যান্সার চিকিৎসায় রোগী বাঁচাতে গেলে ডাক্তারকে কষ্টদায়ক ক্যামোথেরাপি প্রয়োগ করতেই হবে। ভূতে পাওয়া রোগী হলে তো কবিরাজকে গালাগালি করতেও ছাড়বে না। আইন থাকে বইয়ের পাতায় লেখা, তাকে বাস্তবায়ন না করলে আইন তো নিজে বাস্তবায়িত হয় না। জনসম্পদ পচে আপদে পরিণত হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপ দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি; যদিও দেশ গড়ার প্রি-রিকুইজিট হলো জনগোষ্ঠীকে চাহিদামতো জনসম্পদে পরিণত করা। তাছাড়া সংস্কার কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর সন্তুষ্টির জন্য না করে এদেশের অস্তিত্ব, সার্বভৌমত্ব, উন্নতি ও জনসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে। এতে

কোন দল কি ভাবলো, এটা দেখার সময় এখন নেই, সেজন্যই নির্দলীয় অন্তর্বর্তী সরকার। এ সরকারকে কোমরে জোর বেঁধে কাজে নামতে হবে। সবার স্বার্থ রক্ষা করে কাজ করা কঠিন। যে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস শক্ত হাতে দমন করতে হবে। কাউকে বা কোনো মতলববাজ গোষ্ঠীকে কোনোরকম ছাড় দেবার অবকাশ নেই। জনগোষ্ঠী সুশিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত সকল পর্যায়ে অবাধ গণতন্ত্র না দেওয়াই শ্রেয়।
আগের লেখায় রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনে আমার প্রস্তাব ছিল প্রেসিডেন্ট-শাসিত সরকারব্যবস্থা। দেশ চালাবে রাজনৈতিক দলীয় সরকার; রাষ্ট্রের দায়িত্ব দেখভালের জন্য এবং রাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন বিভাগে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য ১৫ থেকে ২১ সদস্যের অরাজনৈতিক 'সুপ্রিম কাউন্সিল' থাকবে, যারা নির্ধারিত অরাজনৈতিক পেশাজীবী নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। এতে বর্তমানে সমমনোভাবাপন্ন দলীয়ভাবে মনোনীত একজন রাষ্ট্রপতি-ব্যবস্থা লোপ পাবে। বিস্তারিত জানার জন্য ২৮.০৮.'২৪ ও ১০.০৯.'২৪ তারিখে প্রকাশিত কলাম পড়ুন। (যুগান্তরে প্রকাশিত আমার সব লেখা পেতে নীচে দেওয়া ওয়েব-পেজ দেখুন)। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুধু একটা নির্বাচন করে দায়িত্ব হস্তান্তর করাই এ সরকারের জন্য যথেষ্ঠ নয়। কালবোশেখির প্রচণ্ড ঝড়ে লাইনচ্যুৎ হওয়া একটা ট্রেনকে লাইনে এনে গন্তব্যে পৌঁছানোর সামগ্রিক ব্যবস্থা ঠিকঠাক মতো করাই ছাত্র-জনতার বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল। আমরা যেন কোনোমতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে যায়। এখান থেকে ফেরার কোনো পথ নেই। আমার দৃষ্টিতে এ বিপ্লব এখনও শেষ হয়ে যায়নি, উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে মাত্র। ছাত্র-জনতাকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে আমরা পারছি না। বিপ্লবের ভাষা কঠিন; এখানে উদারতার কোনো স্থান নেই। উপদেষ্টাদেরও সেই শক্ত মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে অথবা কেউ কেউ অপারগতা দেখালে পদ ছাড়তে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের এত অল্পে পরাভব মানা ঠিক হবে না। 'সংখ্যালঘু নির্যাতন কার্ড' নামে মতলববাজি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা শক্ত হাতে দমন করা এখনই দরকার। দীর্ঘ ১৬ বছর তাদের দাবিদাওয়া কোথায় ছিল? ভারতের মৌলবাদী শাসকগোষ্ঠীর উপমহাদেশব্যাপী হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র কায়েমের উদগ্র আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী মনোভাব, শোষণ, তাদের পালিত পা-চাটা সেবাদাস দিয়ে এদেশ শাসন এবং এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আজ বিপন্নপ্রায়– সবকিছু কুটনৈতিক চ্যানেলে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে।

পরিবেশ এমন যে, দেশপ্রেমী সব রাজনৈতিক দলকে এখন ধৈর্য্য ধরতেই হবে। আমি বারবার লিখে চলেছি যে, ১৪ দল বাদে সব রাজনৈতিক দল একজোট হয়ে দেশরক্ষার প্রয়োজনে সংস্কারের জন্য ভালো পরামর্শ দেবে। যদিও দেশের অনেক মানুষের আত্মোপলব্ধি নেই বললেই চলে; এদেশে 'মুনা যায় উজান, তো ধুনা যায় ভাটি'। বুঝতে হবে: প্রতারণা, স্বার্থপরতা ও 'কর্তাভজা সম্প্রদায়'-এর কারণে স্বাধীনতার কমপক্ষে চল্লিশ বছরের অনেক মূল্যবান সময়ই পার হয়ে গেছে; স্বাধীনতার উদ্দেশ্যের কিছুই অর্জিত হয়নি। ইতিহাস বলে, শুধু মধ্য এশিয়ায়ই অনেক জাতির অস্তিত্ব কালের বিবর্তনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার বড্ড ভয়, গত সপ্তাহের লেখায় লিখেছিলাম, 'জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশপ্রেমী জনগণের এখনই চিন্তাভাবনা করতে হবে; নইলে দূর ভবিষ্যতে দেশ-বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মতো ভিটে-বাড়ি ছেড়ে মাথায় বস্তা ও পোটলা নিয়ে জমির আল বেয়ে বাংলাদেশিদের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী অন্য কোথাও অজানা গন্তব্যে হেঁটে যেতে বাধ্য হবে না, এর নিশ্চয়তা কোথায়?' এ চৈতন্যবোধ দেশপ্রেমী বাংলাদেশিদের যত তাড়াতাড়ি ফেরে ততই দেশের কল্যাণ। আগেও অনেকবার লিখেছি, বাংলাদেশিরা বড্ড আত্মবিস্মৃত ও স্বার্থপর জাতিতে পরিণত হয়েছে; স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও এমন ছিল না। দেশ ও মানুষ গড়তে দুটো বিষয় অপরিহার্য জানতে হবে– দেশকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিতের ওপর দাঁড় করানো এবং জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত করা। যাহোক আজ কয়েকটা প্রস্তাব রাখি।

সরকারের মেয়াদ চার বছর না করে পাঁচ বছর রাখাই সমীচীন হবে। ঘন ঘন নির্বাচনে খরচ বাড়ে। নির্বাচিত সরকার উন্নয়নের কিছু কাজ করতে না করতেই মেয়াদ শেষ হবে। বাংলাদেশিরা রাজনীতি-পাগল হয়ে গেছে। কারণ রাজনীতি এদেশে বিনাপুঁজির লাভজনক ব্যবসা। কোনো জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা নেই। এদের মধ্যে কীভাবে জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনা যায়, তা আগে ভাবা দরকার। সেজন্য সংস্কার। বর্তমানে রাজনীতিতে দেশশোষণ আছে– নেই সমাজসেবা ও জনসেবা; শুধুই মিথ্যাচার, ধাপ্পাবাজি, রাজনীতির ব্যবসা আর প্রতারণার কৌশল। মানুষকে

রাজনীতিমুখীতা থেকে ফিরিয়ে কর্মমুখী ও সমাজসেবামুখী করতে হবে। এরও উপায় ও মডেল আছে। বিকৃতমনা মুখসর্বস্ব লাঠিয়ালবাহিনীর দখলিস্বত্বে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানুষের এদেশে কাজ করার কোনো সুযোগ নেই।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা সংস্কারের কথা শুনছি। এর অনেক দূরদর্শী প্রভাব আছে। স্থানীয় সরকারে দলভিত্তিক নির্বাচন হওয়াতে সমাজে বিভক্তি, দলাদলি, মারামারি, হিংসা-বিদ্বেষ, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুলাংশে বেড়ে গেছে। গ্রামে-গঞ্জে আইনের শাসন নেই বললেই চলে। মুখ ও দল বিবেচনায় শালিস-দরবার হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের চেয়ারম্যান-মেম্বররা শালিসের নামে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে খাচ্ছে। বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই রক্ষা করে কেন্দ্রীয় নেতারা। সমাজে দলীয় স্বজনপ্রীতি বেড়ে গেছে। সামাজিক সুশিক্ষা নির্বাসনে। সরকার থেকে গম, টাকা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি নামে যত আর্থিক সুবিধা যায়, নিজ-দলীয় লোকজনের মধ্যেই বন্টন হতে দেখা যায়, বিরোধী ও সাধারণ লোকজনের কপাল পোড়ে। রাজনীতির দাপটে কেউ কিছু বলেও না। সমাজকে সুস্থ বানাতে বা সমতার নীতি বহাল রাখতে স্থানীয় সরকারে অরাজনৈতিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে বিকৃত রাজনীতির চর্চা সমাজে কমে যাবে। আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শুধু সবাইকে দলে অঙ্গিভূত করে রাজনীতির বিস্তার ঘটাতে চায়। এতে সমাজে রাজনৈতিক টাউট শ্রেণি ও রাজনীতির ব্যবসার উদ্ভব হয়, হয়েছেও তাই। বিকৃত ও মতলববাজি রাজনীতির কারণে দেশ, সমাজ ও শিক্ষা যে ধ্বংস হয়ে গেল, এটা আমরা কেউ ভেবে দেখিনে। দেশে সব সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে রাজনীতি।

এদেশে দেশপ্রেমী দূরদর্শী রাজনীতিবিদের বড় অভাব। প্রায় সব দল দলবাজি করে টিকে থাকতে চায়। কোনো দলই ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করে না, কে কোন দল করে, এটাই তাদের মূল বিবেচ্য বিষয়। দেশকে অন্যায়, দুর্নীতি ও অরাজকতার দিকে ঠেলে দেওয়া যত সহজ, ভালো পথে ফিরিয়ে আনা তত সহজ নয়, এ ভাবনা তাদের মাথায় নেই; তাই বর্তমান এ দশার উৎপত্তি। দেশের পরিবেশ ক্রমেই অবনতির দিকে। শুধু গণতন্ত্র নয়; সমাজে বসবাসরত মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য সমাজে ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে, সামাজিক শিক্ষা ত্বরান্বিত করতে হবে। তা না হলে যত চেষ্টাই করা হোক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান বাড়বে না। গবেষণায় দেখা যায়, এ দুটো চলকের মধ্যে ধনাত্মক সহ-সম্বন্ধ রয়েছে।

পনেরো বছর ধরে যেসব সরকারি বিভাগগুলোকে মনমতো করে দলীয় নিজস্ব লোকবল দিয়ে সাজানো হয়েছে, এত অল্প দিনে নিখাদ কর্মঠ অফিসার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রায় সবাই দলবাজ, দুর্নীতিবাজ, বাকিরা চাকরিচ্যুৎ বা ওএসডি হয়ে বসে আছেন। সরকারি কর্মকর্তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী-কর্মকর্তা। চলনে-বলনে ও কাজে এসব চিন্তাধারা ও আইনের প্রয়োগ উঠে গেছে, তারা এখন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা নেতা। সেজন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী আচরণবিধি পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করতে হবে। এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে ভালো পথে নিয়ে আসা অনেক কষ্টকর বিষয়। এখান থেকে সহজে এ জাতি মুক্তি পাবে না। রাষ্ট্র পরিচালনা (সুপ্রিম কাউন্সিলের মাধ্যমে) সরকার পরিচালনা থেকে আলাদা করে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য এনে বিভিন্ন বিভাগগুলো ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র সুনিশ্চিত করলে নিশ্চয়ই ভালো ফল পাওয়া যাবে। তবে 'অনভ্যাসের ফোটা কপাল চচ্চড় করে' কথাটা ভুললে চলবে না। এদেশে ভোট প্রাপ্তির অনুপাতে সংসদে আসন বণ্টন বিষয়টি বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। সে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথও তখন থাকবে না। সেজন্য মনে হয় প্রবাদটা এভাবে এসেছে, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'।

(১১ নভেম্বর '২৪ যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ; Web: pathorekhahasnan.com